গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২৬ সংখ্যা | ১৬ - ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

এবার সন্দেশখালি

দখলদারির এই ট্র্যাডিশন কি চলতেই থাকবে

সন্দেশখালিতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের অনুগামী বাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিশেষত মহিলাদের বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এলাকার মানুষ বিশেষত মহিলারা বিক্ষোভ শুরু করেন। থানা ঘেরাও করে অত্যাচারী নেতাদের বাড়ি, পোল্ট্রি ফার্মে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, জবর দখল করা ভেড়ি, জায়গা-জমি ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সন্দেশখালির দুটি ব্লকেই। ৮ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড অজয় বাইন সহ দলের কর্মীরা থানার সামনে বিক্ষোভরত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান। বিক্ষোভ জেলিয়াখালি, খুলনা ইত্যাদি এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়লে দলের নেতৃবৃন্দ গ্রামের ভিতরে গিয়ে এলাকার মহিলাদের সাথে কথা বলেন ও আন্দোলনকে সমর্থন জানান। তাঁরা এলাকার মানুষের কাছে গণকমিটি গড়ে আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুসংগঠিত করার আহ্বান জানান। ১৩ ফেব্রুয়ারি বসিরহাটের পুলিশ সুপার ও এসডিও-র কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দলের পক্ষ থেকে পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা, শাসক দলের নির্যাতনকারী নেতাদের গ্রেপ্তার, বিক্ষোভকারীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, অত্যাচার বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রভৃতি দাবি জানানো হয়।

এই বিক্ষোভ সামনে নিয়ে এল এলাকার সর্বময় কর্তা হিসাবে কুখ্যাত শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে

৬ মার্চ গণবিক্ষোভের ডাক এসইউসিআই(সি)-র

নির্বাচনের দামামা বেজে উঠতেই দেশের নির্বাচনসর্বস্ব জাতীয়-আঞ্চলিক সংসদীয় দলগুলো ভোটে কীভাবে জিতে ক্ষমতায় আসীন হতে পারে, সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়ে হলেও কার সঙ্গে জোট করলে দুটো আসন জুটতে পারে বা বাড়তে পারে সেই অঙ্ক কষতে শুরু করে দিয়েছে। দল বদলের হীনতম খেলাও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রচারমাধ্যমও জনসাধারণকে সেই চক্রে মাতিয়ে রাখতে চাইছে।

কিন্তু লোকসভা বা বিধানসভায় জয়ী বা বিরোধী দলের সদস্যদের দেশের হতদরিদ্র মানুষের দাবি কখনও তুলে ধরতে দেখা যায় না। তাই প্রশ্ন হল, নির্বাচনে হারজিতের সাথে সাধারণ মানুষের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক আছে কি? স্বাধীনতার পর ৭৭টা বছর কেটে গেল। কেন্দ্রে গত দশ বছরের বিজেপির শাসন, তার আগে দীর্ঘ দিনের কংগ্রেসী শাসন আর এ রাজ্যে কংগ্রেসের পর বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ১৩ বছরের শাসন কী দিয়েছে জনসাধারণকে? আজও দারিদ্র, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, অর্ধাহার, অনাহার, অপুষ্টির চাপে জনজীবন ক্রমাগত দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। মদের প্রসার বাড়ছে, নারী নির্যাতন নিত্যদিনের ঘটনা। ধর্ম-বর্ণ নিয়ে রক্ত ঝরছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, খনিজ সম্পদ সহ জনগণের টাকায় তৈরি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি জলের দরে আদানি-আম্বানি সহ পুঁজিপতিদের বিপুল মুনাফার স্বার্থে তাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। সংসদে অগণতান্ত্রিকভাবে একের পর এক জনবিরোধী আইন পাশ করানো হচ্ছে। সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী মানুষের উপর চলছে লাগাতার আক্রমণ। জল-জঙ্গলের চিরাচরিত অধিকার থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যাতে রুখে দাঁড়াতে না পারে সেই জন্য ধর্মীয় অন্ধতায় গোটা দেশকে নিমজ্জিত রাখতে বারবার ধর্ম, বর্ণ, জাতপাতের বিভেদকে উসকে দিচ্ছে আরএসএস-বিজেপি। রামমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে গোটা দেশকে ধর্মীয় উন্মাদনায় মাতিয়ে তুলতে চাইছে। শুরু করেছে জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে শোরগোল। অপরদিকে শিক্ষার মর্মবস্তু ও যুক্তিবাদকে ধ্বংস করতে এবং গোটা শিক্ষাব্যবস্থার

দুয়ের পাতায় দেখুন

এসপ্ল্যানেডে অবরোধ স্কিম ওয়ার্কারদের

১২ ফেব্রুয়ারি স্কিম ওয়ার্কারদের বিক্ষোভে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। গ্রেফতার ৩৬। প্রতিবাদে কর্মবিরতির ডাক। সংবাদ আটের পাতায়

পুঁজিপতিদের অবাধ লুঠের সুযোগ দিয়ে জনগণের জন্য সামান্য খয়রাতি

রাজ্যের তৃণমূল সরকার ৮ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধিকরে বা কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজের পাল্টা 'কর্মশ্রী' প্রকল্পে ৫০ দিনের কাজের ঘোষণা করে যে বাজেট পেশ করেছে তার লক্ষ্য যে রাজ্যের জনগণের জীবন-মানের উন্নয়ন নয়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন, তা ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট করে দিয়েছেন অর্থপ্রতিমন্ত্রী। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে পাশ করে বেরোচ্ছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে। সেই যুবসমাজ কোথায় কাজ বা চাকরির সুযোগ পাবে তার কোনও সুনির্দিষ্ট দিশা বাজেটে নেই। ৬টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ইকনমিক করিডোরের ঘোষণা করে সেগুলিতে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের আশা দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তাদের চাকরি হবে তার কোনও নিশানা নেই। মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া। তা আটকানোর কোনও উদ্যোগ নেই। এই ব্যর্থতা ঢাকতেই এবং মানুষের ক্ষোভ কমিয়ে ভোট কুড়োতেই ভিক্ষের খয়রাতি।

রাজ্য বাজেট ভোটের দিকে তাকিয়েই

রাজ্য বাজেটও কেন্দ্রীয় বাজেটের মতো নিতান্তই ভোটমুখী। এই বাজেটের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

— চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য
রাজ্য সম্পাদক, এস ইউ সি আই (সি)

রাজ্যে ৮২০৭টি স্কুল বন্ধকরার জন্য সরকার আগেই তালিকাভুক্ত করেছিল। বাকি স্কুলগুলিতেও হাজার হাজার শিক্ষকপদ শূন্য। পরিকাঠামোর ভগ্নদশা। সেগুলি পূরণের ব্যবস্থার কোনও উল্লেখ বাজেটে নেই। উপরন্তু রাজ্যে বেসরকারি স্কুল খোলার ঢালাও অনুমতি দিতে পোর্টালের ব্যবস্থা করেছে সরকার। এ বার বেসরকরি সংস্থাগুলি সহজেই স্কুল খুলতে পারবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি স্কুলগুলিকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিবর্তে বেসরকারিকরণের ঢালাও ব্যবস্থা করছে সরকার। ইতিমধ্যেই বৃহৎ পুঁজি রাজ্যে রমরম করে শিক্ষা-ব্যবসা চালাচ্ছে। সেই ব্যবসাকেই আরও গতি দেবে বাজেটের এই ঘোষণা।

বাজেটে বলা হয়েছে, এখন থেকে মাধ্যমিক পাশ করে একাদশে ভর্তি হলেই ছাত্রছাত্রীরা স্মার্ট ফোন বা ট্যাব পাবে। প্রয়োজন ছিল ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে ক্লাসমুখী করা, স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগ করে নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা করা। তার পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে মোবাইলমুখী করে তোলার ব্যবস্থা হল। পরিবারে একাধিক সন্তান থাকলে তার জন্য বাড়তি স্থায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হল। এতে পড়াশোনার পরিবর্তে মোবাইল আসক্তি আরও বেড়ে গিয়ে বেশিরভাগ সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যাই বাড়বে।

মিড-ডে মিলের রাঁধুনি-সাহায্যকারীদের ভাতা ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করা হয়েছে। সে-টুকুও দেওয়া হবে ১০ মাসের জন্য। যদিও তার দ্বারাও তাঁরা ন্যূনতম মজুরির ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবেন না। অন্য দিকে ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ কিছুই বাড়ানো হয়নি।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল

দুয়ের পাতায় দেখুন

পুঁজিপতিদের অবাধ লুঠের সুযোগ

একের পাতার পর

মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার স্কিম ২০২৩' চালু হয়েছে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক যাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাতে তাঁদের কী সুবিধা হবে তা পরিষ্কার নয়।

ডিএ-র দাবিতে সরকারি কর্মচারী-শিক্ষকরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করছেন। বাজেটে ৪ শতাংশ নতুন ডিএ-র ঘোষণা হলেও কেন্দ্রীয় হারের তুলনায় তা এখনও ৩২ শতাংশ কম। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি নগণ্য। আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-পৌরস্বাস্থ্যকর্মীদের উপর ক্রমাগত কাজের বোঝা বাড়ানো হচ্ছে, অথচ তাঁদের জন্য কোনও বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি। বন্যা খরা প্রতিরোধে স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সরকার খয়রাতি খাতে যে টাকা বরাদ্দ করেছে, স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে— এই পরিমাণ টাকা আসবে কোথা থেকে? অর্থাৎ সরকারের আয়ের উৎস কী? পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের কারণে অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও নতুন কলকারখানা হচ্ছে না। ফলে উৎপাদন শিল্প থেকে সংগৃহীত যে করই সরকারের আয়ের মূল উৎস হওয়ার কথা, এ রাজ্যে তার পরিমাণ নগণ্য। ফলে ঋণ-ই সরকারের আয়ের প্রায় একমাত্র উৎস। বাজেটের তথ্য অনুযায়ী ৬২ হাজার কোটি টাকা নতুন বোঝা চেপে ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৬.৯৩ লক্ষ কোটি টাকায়। নতুন আর্থিক বছরে শুধু বাজার থেকেই ৭৯,৭২৭ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার কথা ভেবেছে সরকার। অন্য রাজ্যগুলির মতো এ রাজ্যেও ঋণ করে ঘি খাওয়ার পথেই হাঁটছে সরকার। এটা রাজ্যের অর্থনীতির গভীর সঙ্কটেরই প্রকাশ।

ঋণ ছাড়া সরকারের হাতে আয়ের উৎস আর যা আছে তা হল মদ বিক্রি। তৃণমূল সরকার আগামী এক বছরে রাজ্যে মদ বিক্রি করে তুলবে ২১ হাজার ৮৪৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। বাজেটে এই লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে। গত বছরের থেকে এ বার মদ বিক্রি করে ৩ হাজার কোটি টাকা বেশি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। একদিকে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটিকে ধ্বংস করা হচ্ছে, যুব সমাজের কাজের কোনও ব্যবস্থা নেই, অন্য দিকে ছাত্র-যুব সমাজকে মদের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে। স্বাভাবিক ভাবেই যুবসমাজের একাংশের মধ্যে মদে আসক্ত হওয়ার এবং অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ার ঝোঁক বাড়ছে। তার জন্য দায়ী সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারের এই নীতি।

বাজেটে মূল্যবৃদ্ধি রোধে কোনও ব্যবস্থাই নেই। শাক-সব্জি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। কালোবাজারি দাপটে চলছে। বাজেটে এ সবের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করা হয়নি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা বাড়ানো হলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যয়বৃদ্ধিতে তার বহুগুণ গৃহস্থকে খরচ করতে হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে গৃহস্থের আর্থিক সঙ্কট মিটবে না। কিন্তু আরও ৫০০ টাকা এই ভাণ্ডারে দিয়ে মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা হয়েছে।

রাজ্য বাজেট নিয়ে জনগণ যতই অখুশি হোক, খুশি শিল্পমহল। কারণ তাদের জন্য যা যা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে খুশি হওয়ারই কথা। এত দিন প্রোমোটার কিংবা শিল্পের নামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি নিয়ে বৃহৎ পুঁজিপতিরা অন্য কাজে লাগানো বা ফেলে রাখার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা আরবান ল্যান্ড সিলিং (শহরে জমির ঊর্ধ্বসীমা) আইনের কারণে ছিল, এ বার সেই আইনটি পুনর্বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বাজেটে। গত শতকে দীর্ঘ কৃষক আন্দোলন ও গণআন্দোলনের ফল হিসাবে যে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন তৈরি করেছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার, সেই আইনের ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত ধারাগুলি তুলে দেওয়ার ভাবনার কথা বলা হয়েছে বাজেটে। এত দিন পর্যন্ত সরকার বেসরকারি কোনও ক্ষেত্রকে জমি দিলে তা নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য লিজ হিসাবে দেওয়া হত। এ বার লিজে থাকা সব জমিকে মালিকানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এখন থেকে সরকারের সব বিভাগ, সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা, পুর-সংস্থা ও পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিও এই নীতিই অনুসরণ করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই খুশি আবাসন শিল্পের মালিকরা। তারা একে সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে অভিনন্দিত করেছে। কারণ এ বার বিপুল পুঁজি নিয়ে জমি দখলে নামবে ধনকুবের আবাসন ব্যবসায়ীরা। শহরের দরিদ্র, নিম্নবিত্তরা এই জমি মাফিয়াদের আক্রমণের মুখে পড়বে। বস্তিগুলিও উচ্ছেদের মুখে পড়বে।

সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে মোট ২৯২০ মেগাওয়াটের চারটি সুপার ক্রিটিকাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জনগণের টাকায় বৃহৎ পুঁজির জন্য মুনাফার ব্যবস্থা। যুব উদ্যোগপতিদের সহজে, কম সুদে, বন্ধকহীন ঋণের নামে ৪ শতাংশের অতিরিক্ত সুদ সরকার নিজেই মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নানা অছিলায় এর সুযোগ নেবে শিল্পমহলই। লোকসভা নির্বাচনে আঞ্চলিক পুঁজিপতিদের সমর্থন আদায় করতে ভোটের আগেই তাদের সামনে এমন সব লোভনীয় ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

এই বাজেটের তীব্র সমালোচনা করে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাজেটের মতো রাজ্য বাজেটও নিতান্তই ভোটমুখী।

৬ মার্চ গণবিক্ষোভের ডাক

একের পাতার পর

সর্বাঙ্গীন বেসরকারিকরণ করতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ প্রণয়ন করেছে তারা।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও একই পথের পথিক। পূর্বতন সিপিএম সরকারের পদাঙ্কঅনুসরণ করে তারাও এ রাজ্যে পুঁজিপতিদের তোষণ করে চলেছে। কেন্দ্রে এবং অন্যান্য রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের মতো এ রাজ্যের তৃণমূলের নেতাকর্মীরাও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। মুখে কেন্দ্রের বিরোধিতা করলেও তারা একইভাবে বাস্তবে কেন্দ্রের নীতিগুলিকেই কার্যকর করে চলেছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাদের পরিচালনাধীন এজেন্সি দিয়ে তদন্ত করানোয় চূড়ান্ত দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা অনেকেই জেলে বন্দি। যদিও কেন্দ্রে বা বিজেপি শাসিত রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে এইসব এজেন্সিকে কাজে লাগাচ্ছে না বিজেপি সরকার। এ রাজ্যে রেশন, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, চিটফান্ড, কয়লা পাচার, গরু পাচার সহ একের পর এক দুর্নীতি প্রতিদিন সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছে। গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে সিন্ডিকেট রাজ, কাটমানির খেলা। জনগণকে দমিয়ে রাখতে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে তারা সন্ত্রাসের ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের দুটি সরকারই পুঁজিবাদের স্বার্থকে রক্ষা করে চলেছে। কারণ পুঁজিপতিরাই তাদের ফান্ডে অজস্র টাকা ঢালে নিজেদের স্বার্থরক্ষার শর্ত হিসাবে।

এই অবস্থায় সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে, পুঁজিপতিদের টাকায় চলা এই দলগুলো তাদের ভাষণে যতই পরস্পর বিরোধিতার ভান করুক, আসলে সকলেই একই পথের পথিক। যতদিন এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হবে ততদিন জনগণের দুরবস্থার কোনও মৌলিক পরিবর্তন হবে না। তাই সাধারণ মানুষকে দলমত নির্বিশেষে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলে দাবি আদায়ের লড়াইয়ে নামতে হবে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এটাই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষা। একদিন বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বাংলায় বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনের মধ্যে সংগ্রামী বামপন্থার নীতি না থাকার ফলে তারা গণআন্দোলনের পথকে পরিত্যাগ করেছে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনে কিছু আসনের আশায় সংগ্রামী বামপন্থার পথ থেকে সরে গিয়েছে। এটা দুঃখের এবং বেদনার। বাম মনোভাবাপন্ন সকল মানুষকে গভীর ভাবে এটা ভেবে দেখতে হবে।

এই লক্ষ্য থেকেই এসইউসিআই(সি) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে। এ পথেই বহু দাবি আদায় হয়েছে। সেই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও তীব্র করে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। দলের পক্ষ থেকে আগামী ৬ মার্চ রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভের আহ্বান জানানো হয়েছে। ওই দিন রাজ্যের সর্বত্র জেলাস্তরে বা মহকুমা এবং ব্লকস্তরে প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ হবে।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অশোকনগর সংগঠনী কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ভূপেন দাস ২২ জানুয়ারি রাতে কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি অনেকদিন ধরেই নানা রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ সহ হাবড়া ও অশোকনগরের বহু কর্মী ও সমর্থক তাঁর বাড়িতে যান এবং মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ তাঁর অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও গুণমুগ্ধ মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি কমরেড যোগেন দাসের মাধ্যমে তিনি দলের বৈপ্লবিক চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। ওই সময় কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে ভিত্তি করে হাতে গোনা যে ক'জন এইসব এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন কমরেড ভূপেন দাস তাঁদের মধ্যে একজন। তখন এই এলাকায় সিপিএম, সিপিআই-এর প্রভাব থাকায় সঠিক বিপ্লবী বামপন্থী রাজনীতি বুঝিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তখন কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড সনৎ দত্ত নিয়মিত হাবড়ায় আলোচনার জন্য যেতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষও হাবড়ায় আলোচনা সভায় গেছেন। কমরেড ভূপেন দাস এইসব আলোচনায় নিজে যোগ দিতেন এবং অন্যদেরও সাথে নিয়ে আসতেন। তাঁর বাবা ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য। ফলে বাড়িতে গান্ধীবাদী চিন্তার সাথে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট আমলে তিনি বৃহত্তর হাবড়া-অশোকনগর এলাকায় যুক্ত আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে বসিরহাটের স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে নুরুল ইসলাম শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। কমরেড ভূপেন দাস রাত্রের মধ্যেই এই আন্দোলনের উপর পথনাটিকা লিখে সাইকেল চালিয়ে হাবড়া থেকে স্বরূপনগর চলে যান এবং অন্যদের যুক্ত করে সেখানে পথনাটিকা প্রদর্শন করেন। আটের দশকে হাবড়া এলাকায় যখন আদিবাসী সংগঠন গড়ে তোলা হয়, কমরেড ভূপেন দাস যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সরকারি কর্মচারী হয়েও আদিবাসী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য সিপিএমের গুন্ডাবাহিনীর হাতে তিনি নিগৃহীত হয়েছেন। এই প্রজন্মের নবীন কমরেডরা তাঁর কাছে অতীত দিনের এইসব আলোচনা শুনে খুবই উৎসাহিত হতেন। অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি দলীয় কাজের সাথেই নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক সাহসী ও সংগ্রামী সাথীকে।

কমরেড ভূপেন দাস লাল সেলাম

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (১৭)

ভি আই লেনিন

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার সপ্তদশ কিস্তি।

পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ

মার্ক্স আরও বলেছেন ঃ "পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে এক সমাজ থেকে আর এক সমাজের বিপ্লবাত্মক উত্তরণের জন্য একটা পর্যায় আছে। এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে একটা রাজনৈতিক উত্তরণকালীন পর্যায়ও আছে। এই পর্যায়ে রাষ্ট্র, সর্বহারার বিপ্লবী একনায়কত্ব ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।"

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সর্বহারা শ্রেণির ভূমিকা, এই সমাজের বিকাশ সম্পর্কে নানা তথ্য এবং বুর্জোয়া ও সর্বহারার স্বার্থের অনিরসনীয় বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মার্ক্স এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

আগে বিষয়টিকে এইভাবে উত্থাপন করা হত ঃ মুক্তি অর্জন করতে হলে সর্বহারাকে বুর্জোয়াদের উৎখাত করতে হবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে এবং তাদের বিপ্লবী একনায়কত্ব কায়েম করতে হবে।

এখন এই প্রশ্নকে কিছুটা ভিন্ন ভাবে উত্থাপন করা হয় ঃ যে পুঁজিবাদী সমাজ সাম্যবাদের দিকে বিকশিত হচ্ছে, সেই পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণ "একটা রাজনৈতিক উত্তরণকালীন পর্যায়" ছাড়া অসম্ভব। এই পর্যায়ে রাষ্ট্র সর্বহারার বিপ্লবী একনায়কত্ব ছাড়া কিছু হতে পারে না।

তা হলে, এই একনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক কী?

আমরা দেখেছি, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো দুটো ধারণা একেবারে পাশাপাশি রেখেছে ঃ "সর্বহারা শ্রেণিকে শাসক শ্রেণির জায়গায় উন্নীত করা" এবং "গণতন্ত্রের লড়াইয়ে জয়লাভ করা"। উপরে যা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা সম্ভব পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র কী ভাবে পরিবর্তিত হয়।

পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আমরা মোটামুটি পূর্ণ গণতন্ত্র দেখতে পাই। কিন্তু এই গণতন্ত্র সবসময় পুঁজিবাদী শোষণের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই, বাস্তবে এই গণতন্ত্র হল সংখ্যালঘু শ্রেণির গণতন্ত্র, কেবলমাত্র সম্পত্তির মালিক শ্রেণির, ধনীদের গণতন্ত্র। প্রাচীন গ্রিক প্রজাতন্ত্রে যেমন স্বাধীনতা ছিল শুধু দাস মালিকদের জন্যই, পুঁজিবাদী সমাজেও স্বাধীনতা ঠিক তেমনই। আধুনিক মজুরি-দাসেরা পুঁজিবাদী শোষণের ফলে অভাব ও দারিদ্রের চাপে এতটাই পিষ্ট যে, 'তারা গণতন্ত্রের কথা ভাবারই সময় পায় না', 'তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না'। সাধারণ শান্তিপূর্ণ সময়ে জনসাধারণের অধিকাংশই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

এই বক্তব্যের সঠিকতা সম্ভবত জার্মানি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। কারণ ওই দেশে

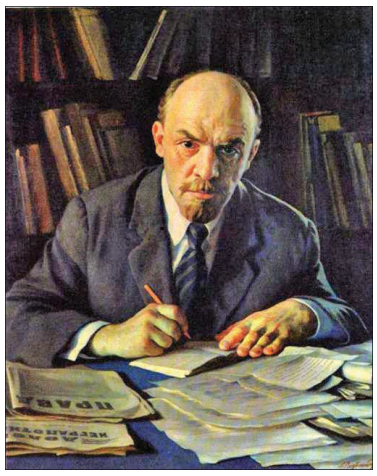

সাংবিধানিক কানুনি ব্যবস্থা একনাগাড়ে উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী হয়ে থেকেছে। সময়টা প্রায় পঞ্চাশ বছর (১৮৭১-১৯১৪)। এই সময়কালের মধ্যে জার্মানিতে সোসাল ডেমোক্রেসি 'কানুনি ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে' অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছে। সেখানে তারা বিশ্বের যে কোনও দেশের তুলনায় শ্রমিকদের একটা বড় অংশকে রাজনৈতিক দলে সংগঠিত করতে পেরেছে।

পুঁজিবাদী সমাজে এই সর্বোচ্চ সংখ্যক রাজনীতি সচেতন শ্রমিক ও সক্রিয় মজুরি-দাসের অনুপাতটি কেমন? দেড় কোটি শ্রমিকের মধ্যে সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য হল দশ লক্ষ! এই দেড় কোটির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত তিরিশ লক্ষ!

অত্যন্ত অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য, ধনীদের জন্য গণতন্ত্র—এই হল পুঁজিবাদী সমাজের গণতন্ত্র। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের কলাকৌশলগুলি খুব কাছ থেকে দেখলে আমরা সর্বত্র ভোট ব্যবস্থার 'ক্ষুদ্র'—তথাকথিত ক্ষুদ্র খুঁটিনাটিগুলি দেখতে পাব (বাসস্থানের যোগ্য প্রমাণ, নারীদের বাদ দেওয়া ইত্যাদি)। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের কায়দাকানুন, সভা-সমিতির ওপর বাস্তব বাধানিষেধ (সরকারি বিল্ডিং 'ভিখারিদের' জন্য নয়!), পুরোপুরি পুঁজিবাদী রূপে সংগঠিত দৈনিক সংবাদপত্র, ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্যে আমরা দেখতে পাব গণতন্ত্রের উপর চাপানো একটার পর একটা বিধিনিষেধ। এই সব বিধিনিষেধ, ব্যতিক্রম, একাংশকে বাদ দেওয়া, গরিবের জন্য বাধা সৃষ্টি করা তুচ্ছ মনে হয় বিশেষত তাদের চোখে, যারা দারিদ্র কী জিনিস জানে না, যারা এই নিপীড়িত শ্রেণির জনজীবনের সংস্পর্শে কখনও আসেনি (একশ ভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ না হলেও, অন্তত দশ ভাগের নয় ভাগ বুর্জোয়া প্রকাশক ও রাজনীতিবিদ এই স্তরের)। কিন্তু সব বাধার সামগ্রিক যোগফল হল তা দরিদ্র মানুষকে রাজনীতি থেকে, গণতন্ত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দেয়, এর থেকে তাদের বহিষ্কার করে।

মার্ক্স কমিউনের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের এই মর্মবস্তুকে চমৎকারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কয়েক বছর অন্তর অন্তর শোষিত মানুষকে অনুমতি দেওয়া হয় বেছে নিতে যে, তাদের প্রতিনিধি হিসাবে শোষক শ্রেণির কোন কোন বিশেষ প্রতিনিধি তাদের উপর নিপীড়ন চালাবে!

কিন্তু অবশ্যম্ভাবীরূপে এই পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সুকৌশলে দরিদ্র মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই, এই গণতন্ত্র ভণ্ডামিতে পূর্ণ, আপাদমস্তক মিথ্যাচারে ভরা। এই গণতন্ত্রের অগ্রগতির বিষয়ে লিবারাল পণ্ডিত ও পেটি বুর্জোয়া সুবিধাবাদীরা আমাদের যা বিশ্বাস করাতে চায়, তা তেমনভাবে সরল, সোজাসুজি, বিনা বাধায় "আরও বৃহত্তর গণতন্ত্রের" দিকে এগিয়ে যায় না। না, তার সামনের দিকে অগ্রগতি, অর্থাৎ কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে যাওয়া, তা একমাত্র সর্বহারা একনায়কত্বের মাধ্যমেই ঘটতে পারে। অন্য কোনও ভাবে এ কাজ হতে পারে না, কারণ, অন্য কারও পক্ষে, অন্য কোনও ভাবে পুঁজিবাদী শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা সম্ভব নয়।

সর্বহারার একনায়কত্ব, অর্থাৎ নিপীড়ক শ্রেণিকে দমন করার উদ্দেশ্যে শাসক হিসাবে সংগঠিত নিপীড়িত শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীর জন্ম নিছক গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার মধ্য দিয়েই হতে পারে না। সর্বহারা একনায়কত্ব গণতন্ত্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায়, যা হয়ে ওঠে দরিদ্রের জন্য সর্বপ্রথম গণতন্ত্র, হয়ে ওঠে জনগণের জন্য প্রথম গণতন্ত্র। একই সাথে তা নিপীড়ক, শোষক, পুঁজিপতিদের স্বাধীনতার ওপর একের পর এক বিধিনিষেধ অরোপ করে। এই গণতন্ত্র ধনীদের জন্য নয়। মজুরি দাসত্ব থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য আমাদের শোষকদের দমন করতেই হবে, বলপ্রয়োগের দ্বারা তাদের প্রতিরোধকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে হবে। এ কথা পরিষ্কার, যেখানে দমন পীড়ন আছে, যেখানে বলপ্রয়োগ আছে, সেখানে কোনও স্বাধীনতা নেই, সেখানে কোনও গণতন্ত্র থাকতে পারে না।

বেবেলকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস এ কথা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। পাঠকরা স্মরণ করতে পারবেন, তিনি বলেছেন, "সর্বহারা শ্রেণি স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে না। তারা রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে তাদের বিরোধীদের দমন করার জন্য। স্বাধীনতার কথা তখনই বলা সম্ভব হবে, যখন রাষ্ট্র বলতে কিছু থাকবে না।"

বিপুল পরিমাণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য গণতন্ত্র এবং জনগণের শোষক ও নিপীড়কদের সবলে দমন করা, অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে তাদের বের করে দেওয়া, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে যাওয়ার উত্তরণের পর্যায়ে গণতন্ত্রকে এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

একমাত্র সাম্যবাদী সমাজেই, যখন পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া গেছে, যখন পুঁজিপতিদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়েছে, যখন কোনও শ্রেণির অস্তিত্ব নেই (অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদন-উপকরণের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজের সদস্যদের মধ্যে যখন কোনও পার্থক্য নেই), একমাত্র তখনই 'রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়'। একমাত্র তখনই 'স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব।' একমাত্র তখনই, সত্যিকারের পূর্ণ গণতন্ত্র, কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই গণতন্ত্র সম্ভব হবে ও তা বাস্তবে অর্জন করা যাবে। আর একমাত্র তখনই গণতন্ত্র বিলীন হয়ে যেতে শুরু করবে। তার কারণটা সরল— পুঁজিবাদের দাসত্ব, অবর্ণনীয় বিভীষিকা, বর্বরতা, মূঢ়তা, কলঙ্কজনক জীবনের হাত থেকে মুক্ত জনগণ সমাজ জীবনের প্রাথমিক নিয়মগুলি পালনে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এই সব রীতিনীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জানা আছে, হাজার হাজার বছর ধরে পাণ্ডুলিপিতে, প্রবাদ প্রবচনে তা বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। জনসাধারণ এগুলি পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে কোনও বলপ্রয়োগ, বাধ্যবাধকতা, অধীনতা ছাড়াই। এই সব রীতিনীতি পালনে বাধ্য করার জন্য রাষ্ট্র নামে অভিহিত বলপ্রয়োগের বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন আর থাকবে না।

'রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাবে', এই প্রকাশভঙ্গি খুব সুন্দরভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। কারণ, এর মধ্য দিয়ে ওই প্রক্রিয়াটির পর্যায়ক্রমিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত উভয় দিককেই বোঝানো হয়েছে। একমাত্র অভ্যাসের শক্তিই এই ধরনের প্রভাব খাটাতে পারে এবং নিঃসন্দেহে তা করবেই। আমরা আমাদের চারপাশে লক্ষ বার দেখতে পাই, শোষণ না থাকলে, ক্ষোভ-ঘৃণা উদ্রেকের কোনও বিষয় না থাকলে, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের জন্ম দেওয়া এবং তা দমন করার প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এমন কারণ না থাকলে কত সহজেই মানুষ সামজিক জীবনের আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি মানতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

সুতরাং, পুঁজিবাদী সমাজে আমরা পাই খণ্ডিত, ঘৃণ্য, নকল গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র শুধু ধনীর জন্য, শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের মানুষের জন্য। এই প্রথম সর্বহারা একনায়কত্ব, সাম্যবাদে উত্তরণের পর্যায়ে জনগণের জন্য, অধিকাংশ মানুষের জন্য গণতন্ত্রের জন্ম দেবে। একই সাথে তা সমাজে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ শোষকদের প্রয়োজনীয় দমন পীড়ন করবে। সাম্যবাদই একমাত্র যথার্থ পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র দিতে পারে। এবং গণতন্ত্র যত পূর্ণাঙ্গ হতে থাকবে ততই তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং নিজে নিজেই বিলীন হয়ে যাবে।

অন্য কথায় বলতে গেলে, পুঁজিবাদে যথার্থ অর্থে রাষ্ট্র আছে। অর্থাৎ, এক শ্রেণির হাতে অন্য শ্রেণিকে দমনের বিশেষ যন্ত্র, সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠকে দমনের যন্ত্র পুঁজিবাদেই আছে। স্বাভাবিকভাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষকে নিয়মিতভাবে দমন করে চলার মতো একটা কাজ সাফল্যের সাথে করার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষক শ্রেণির প্রয়োজন হয় প্রবল নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা। তার জন্য যে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, দাসত্ব, ভূমি দাসত্ব ও মজুরি দাসত্বের জীবনে মানব-জাতি তার মধ্য দিয়ে চলতেই বাধ্য হয়েছে।

আবার, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের কালে দমন পীড়নের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত সংখ্যালগিষ্ঠ শোষককে দমন করে। একটা বিশেষ দমনের যন্ত্র,

সাতের পাতায় দেখুন

সংক্ষেপে

বাজেটে নামমাত্র বেতনবৃদ্ধি প্রতিবাদ মিড ডে মিল কর্মীদের

২০১৩ সালের পর এবারের বাজেটে রাজ্য সরকার মিড ডে মিল কর্মীদের ৫০০ টাকা বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। এ প্রসঙ্গে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পন্ডা ৮ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্যের মিড ডে মিল কর্মীরা আশা করেছিলেন তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করে কমপক্ষে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকাদের সমান অর্থাৎ ৬৩০০ টাকা করা হবে। কারণ মিড ডে মিল কর্মীরা সহায়িকাদের মতো রান্নার কাজ করেন। তাঁদের দাবি— মিড ডে মিল কর্মীদের সরকারি কর্মীর মর্যাদা, বেতন বৃদ্ধি করে আপাতত ৬৩০০ টাকা করা এবং বছরে ১২ মাসের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

দিল্লিতে মসজিদ ভেঙে ফেলার প্রতিবাদ সিপিডিআরএস-এর

মেহরোলি এলাকায় অবস্থিত ৬০০ বছরের পুরনো আখুন্দজি মসজিদটি দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটি ৩০ জানুয়ারি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিয়েছে। এর তীব্র নিন্দা করেছে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক এক বিবৃতিতে বলেন, ধ্বংস করে দেওয়া বাবরি মসজিদের স্থানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে উন্মাদনা তৈরির রেশ কাটতে না কাটতেই মসজিদ ভেঙে ফেলা, উত্তর প্রদেশের জ্ঞানবাপী মসজিদ সংলগ্ন বিতর্কিত এলাকায় বারাণসী আদালতের পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনের কাছে দেশের অভ্যন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ ভাবে কঠোর ভূমিকা পালনের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষের কাছে সমাজে সুস্থ পরিবেশ ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মহিলা বন্দিরা জেলেই অন্তঃসত্ত্বা, প্রশাসনকে তীব্র ধিক্কার এআইএমএসএস-এর

রাজ্যের সংশোধনাগারে ১৯৬ জন মহিলা বন্দি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন বলে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এআইএমএসএস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশে এর চেয়ে লজ্জাজনক খবর আর কী হতে পারে! ঘটনা থেকে স্পষ্ট, সরকারি সংশোধনাগারেও মহিলারা নিরাপদ নন। সেখানেও তারা নির্যাতন, ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন।

এই ঘটনার জন্য সরকার তথা প্রশাসনকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে তিনি বলেন, বাইরে থেকে পুরুষদের মহিলা সেলে ঢোকার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, নাকি পুরুষ কারাকর্মীরাই এ ঘটনা ঘটাচ্ছে, তা অবিলম্বে তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে, দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে আর একটিও এমন ঘটনা না ঘটে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

জনস্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালায় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয় কলকাতার ক্রিক রো-তে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা। কর্মশালায় হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্প নিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা হয়।

শুরুতেই খসড়া প্রস্তাব পাঠ করেন মানস কর। তা নিয়ে আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী ও ভোটকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সাথেই হাসপাতালের প্রশাসনিক হয়রানি, ভগ্ন পরিকাঠামো, অস্থায়ী নিয়োগ, বেসরকারিকরণ, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে সাধারণ মানুষের সুসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পারিয়া। বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ ঝোটন দাস ও ডাঃ সত্যজিৎ রায়, এসডিএফ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, প্রাক্তন এমপি ও সংগঠনের সহ সভাপতি ডাঃ তরুণ মণ্ডল, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ অশোক কুমার সামন্ত।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দ না করার প্রতিবাদ

কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী বাজেটে বহু প্রতিক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কোনও টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় প্রতিবাদে ২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বানভাসিরা ঘাটালের কলেজ মোড় সংলগ্ন পাঁশকুড়া বাসস্ট্যান্ডে বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান।

উল্লেখ্য, কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়ে গত ১৭ জানুয়ারি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং সেখাওয়াত ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় বাজেটে ওই প্রকল্পের বিষয়ে কোনও উল্লেখ না থাকায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ২০ লক্ষাধিক ফি-বছরের বানভাসি মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

বন্ধ বাগান খোলার দাবিতে চা-শ্রমিকদের মিছিল

৬ ফেব্রুয়ারি এসইউসিআই(সি) দলের পক্ষে আলিপুরদুয়ারের রামঝোরা চা বাগান সহ বিভিন্ন বন্ধ চা বাগান খোলা, ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা এবং বন্ধ চা বাগান এলাকার ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-ফি মকুব, বিদ্যুতের মাশুল কমানো, ফিক্সড চার্জ-মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার করার দাবিতে বীরপাড়া সহকারি লেবার কমিশনার (এএলসি) দফতরে ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মিছিল বীরপাড়া পুরোনো বাসস্ট্যান্ড থেকে বাজার পরিক্রমা করে চৌপথি হয়ে এলসি দপ্তরে পৌঁছায়। পরে বিদ্যুৎকেন্দ্রে মিছিল যায়। বিভিন্ন চা বাগান থেকে আসা শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন।

এএলসি দপ্তরে ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(সি)-এর মাদারিহাট বীরপাড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মৃণাল কান্তি রায়, রামঝোরা চা বাগানের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা কমরেড সুধিষ্ঠ বরাইক, কমরেড সুভাষ চিকবরাইক, মুজনাই চা বাগানের শ্রমিক নেতা কমরেড মনোজ মুণ্ডা প্রমুখ। বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন দলের লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড তপন ভৌমিক, কমরেডস বিপ্তি ওরাওঁ, সুদীপ দাস প্রমুখ।

সরকারি নিয়োগপত্রের দাবিতে

কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার কর্মীদের কনভেনশন

২৮ জানুয়ারি ডায়মন্ডহারবার হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় সরকারের এন আর এল এম এবং রাজ্য সরকারের আনন্দধারা প্রকল্পে কর্মরত সিএসপি (কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার) কর্মীদের জেলা কনভেনশন। সরকারি স্বীকৃতি, নিয়োগপত্র, সরকারি গ্রুপ-ডি কর্মীদের মতো মাসিক বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি, সাইকেল, মোবাইল, গাড়ি ভাড়ার খরচ, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ও পেনশন চালু সহ ৯ দফা দাবিতে এ দিন দক্ষিণ ২৪ পরগণার ২৩টি ব্লক থেকে তিনশোর বেশি কর্মী ডায়মন্ডহারবার স্টেশনে জমায়েত হয়ে মিছিল করে কনভেনশনস্থলে আসেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কনভেনশনের উদ্যোক্তা মনিরুল ইসলাম।

মূল প্রস্তাবের সমর্থনে ১৪ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউ সি-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্যামল প্রামাণিক সহ অন্যরা। সভাপতিত্ব করেন নন্দিতা অধিকারী। কনভেনশন থেকে নিবেদিতা দাস সরদারকে সম্পাদিকা, নন্দিতা অধিকারীকে সভাপতি এবং কাকলী নস্করকে কোষাধ্যক্ষ করে ৫২ জনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সিএসপি কর্মী ইউনিয়ন গঠিত হয়।

হরিয়ানায় মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

১২ জানুয়ারি হরিয়ানার পঞ্চকুলাতে শিক্ষা বিভাগে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত মিড ডে মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ১২ মাসই বেতন দেওয়া, ৫ লক্ষ টাকা চিকিৎসা বিমা, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন নিশ্চিত করা ইত্যাদি ১০ দফা দাবি জানানো হয়। নেতৃত্ব দেন সুনীতা, অনীতা, সন্তোষ, সুমিত্রা, কবিতা প্রমুখ।

ইউরোপ ঃ একদিকে অতি-দক্ষিণপন্থী ঝড় অন্য দিকে আন্দোলনের জোয়ার

১৭৫ বছর আগে কার্ল মার্ক্স লিখেছিলেন, ইউরোপকে তাড়া করছে কমিউনিজমের ভূত। একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইউরোপকে ভূত তাড়া করছে ঠিকই, তবে সেই ভূত অতি দক্ষিণপন্থার।

নেদারল্যান্ডসে হের্ট ভিল্ডার্সের অতি দক্ষিণপন্থী 'পার্টি ফর ফ্রিডম' ক্ষমতায় এসেছে। ইটালির বুকে ডানা ঝাপটাচ্ছে মুসোলিনির উত্তরসূরীরা। দেশের ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী মেলোনির অতি ডান 'ব্রাদার্স অফ ইটালি'। সঙ্গে জোটসঙ্গী ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার সালভিনির 'লিগা নর্ড'। দুটিই কট্টর দক্ষিণপন্থী, শরণার্থী বিরোধী দল। জার্মানিতে বিপুল শক্তিবৃদ্ধি করেছে 'অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি' (এএফডি)। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে রীতিমতো সরকার ফেলার ছক কষছেন অতি ডানপন্থীরা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে সেই 'বিপ্লবের' খবর প্রকাশিত হচ্ছে। যাবতীয় 'অ-জার্মান' এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষজনকে, এমনকি তাঁরা যদি জার্মানির নাগরিকও হন, দেশ থেকে তাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে প্রকাশ্যে। দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে 'জার্মানি ফার্স্ট'স্লোগান।

এর মাঝেই ভেঙে গিয়েছে জার্মানির শক্তিশালী বামপন্থী দল 'ডি লিংকে'। তাদের জনপ্রিয় নেত্রী সাহরা ওয়াজেনকনেচ, যিনি সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানির সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির মাধ্যমে রাজনীতি শুরু করেছিলেন, নতুন দল তৈরি করেছেন। অবশ্য তাতে শাপে বর হয়েছে। কারণ সাহ্‌রা ১৪ শতাংশ ভোট পেতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে সাম্প্রতিক সমীক্ষা। একইসঙ্গে তিনি নিও-নাজি এএফডির ভোট কেটে নিতে পারেন ৪ শতাংশ। কিন্তু সার্বিকভাবে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

জার্মানির মতো অতখানি না হলেও স্পেনে শক্তি বাড়ছে অতি ডানপন্থী 'ভক্স'-এর। যদিও সেখানে মধ্য বাম সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টিও শক্তিশালী। হাঙ্গেরিতে ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবানের অতি দক্ষিণপন্থী 'ফিদেজ'। পোল্যান্ডে ক্ষমতায় 'ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি', অস্ট্রিয়ায় ক্ষমতায় 'ফ্রিডম পার্টি'। প্রতিটিই চরম দক্ষিণপন্থী। ফ্রান্সেও বিপুল শক্তিশালী অতি ডানপন্থী লা পেনের দল 'ন্যাশনাল র‍্যালি'।

শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্সের প্যারিস। ২০২৩

ফ্রান্সের পরিস্থিতি অবশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বামপন্থী সাংসদ জাঁ লুক মেলেনকঁর দল 'লা ফ্রান্স ইনসৌমিসে', যাকে পশ্চিমের মিডিয়া 'অতি বামপন্থী' বলে প্রচার করে, তারাও অত্যন্ত শক্তিশালী। গত নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে ২২ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন একসময় 'সরাসরি' কমিউনিস্ট রাজনীতি করা মেলেনকঁ অতি ডান লা পেনের চেয়ে মাত্র ১ শতাংশ কম ভোট পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে পারেননি। যদি ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি আলাদা লড়ে ৩ শতাংশ ভোট না কেটে নিত, হয়তো ফ্রান্সের রাজনীতি অন্যরকম হত। জেরেমি করবিন ছাড়া ইউরোপের মেইনস্ট্রিম 'বামপন্থী' নেতাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন মেলেনকঁ। করবিনের মতো ইনিও ঝুঁকি নিতে ভয় পান না। করবিন এবং মেলেনকঁ দু'জনেই সোচ্চারে প্যালেস্টাইনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। সেজন্য তাঁদের রীতিমতো মুণ্ডুপাত করছে পশ্চিমের মিডিয়া।

ফ্রান্সে যে কোনও কিছুই হতে পারে। ডান অথবা বাম— যে কোনও দিকেই হাঁটতে পারে রাজনীতি। কিন্তু তার বাইরে ইউরোপের অধিকাংশ দেশই এখন দেখছে বিপুল অতি দক্ষিণপন্থী উত্থান। আগামী জুনে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের নির্বাচন। সেখানে অতি দক্ষিণপন্থী ব্লকের দারুণ ফলাফলের সম্ভাবনা। ষষ্ঠ স্থান থেকে একলাফে তৃতীয় স্থানে উঠে আসতে পারে তারা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘদিন মূলধারার রাজনীতিতে প্রায় অচ্ছুৎ অতি দক্ষিণপন্থীরা এমন জনপ্রিয় হলেন কেমন করে? শরণার্থী সংকট কি তাঁদের অক্সিজেন দিল? নাকি আরও কিছু কারণ? মধ্য বাম, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট বা মধ্য ডানপন্থীদের ব্যর্থতাই কি অতি দক্ষিণপন্থার উত্থানের পথ করে দিল? সেই আলোচনা দীর্ঘ। তবে বাস্তবিকই ইউরোপের জন্য 'এ বড় সুখের সময় নয়'।

জেরেমি করবিন লেবার পার্টির নেতৃত্বে আসার পর ব্রিটেনের রাজনীতিতে যে বাম উত্থান হয়েছিল, এখন আর তেমন পরিস্থিতি নেই। লেবার পার্টি জিতবে, তবে এই লেবার কয়েক বছর আগের মধ্য বাম অবস্থান থেকে অনেকখানি ডানে সরে গিয়েছে। করবিন ইতিমধ্যেই বহিষ্কৃত। গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত শক্তিশালী, তাদের ভোটও সম্প্রতি বেড়েছে, কিন্তু গোটা দেশের সংসদীয় রাজনীতির নিরিখে তা বেশ কম। পর্তুগাল, অস্ট্রিয়াতেও কিছু পকেটে কমিউনিস্টরা শক্তিশালী। রাজধানী ভিয়েনার পর অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গ্রাজের মেয়র একজন কমিউনিস্ট। পর্তুগিজ কমিউনিস্টদের একাধিক সাংসদ আছেন।

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে অতি ডানের উত্থান হবে ঠিকই, তবে বামপন্থীদের ফলও খুব খারাপ হবে না। সমস্যা হল বামেরা বিভিন্ন ব্লকে ভাগ হয়ে আছেন।

কিন্তু ভোট রাজনীতির পাটিগণিতে সবটুকু বিচার করা যাবে না। **অতি দক্ষিণপন্থার উত্থানের মাঝেই ভীষণ উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় হল, গোটা ইউরোপ জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার বইছে। ব্রিটেনে একের পর এক ধর্মঘট চলছে। জুনিয়র ডাক্তাররা দফায় দফায় ধর্মঘট করছেন রেল শ্রমিক, লন্ডনের টিউবরেলের কর্মীরা ধর্মঘট করছেন। গত ১৮ জানুয়ারি গোটা উত্তর আয়ারল্যান্ড লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।** যাকে বলা হল উত্তর আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধর্মঘট। ইউরোপের অন্য দেশগুলিতেও পরিস্থিতি প্রায় একই রকম। সুইডেনে টেসলার শ্রমিকরা বিরাট আন্দোলনে নেমেছেন। সুইডিশ শ্রমিকদের সংহতিতে অন্য দেশের শ্রমিকরাও পথে নামছেন। টেসলার শ্রমিক আন্দোলন ইতিহাস তৈরি করছে। ফিনল্যান্ডেও বইছে ধর্মঘটের জোয়ার। জার্মানি এবং ফ্রান্সে কৃষকরা ট্রাক্টর নিয়ে পথে নেমেছেন। প্যারিসে ঢোকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে রেখেছিলেন তাঁরা।

অন্য মহাদেশ লাতিন আমেরিকার আর্জেন্টিনায় নিজেকে 'অ্যানার্কো ক্যাপিটালিস্ট' বলে সদ্য ক্ষমতায় আসা চরম দক্ষিণপন্থী প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেইয়ের বিরুদ্ধে সে দেশের শ্রমিক শ্রেণি প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে ধর্মঘটে ফেটে পড়েছেন। ঠিক তেমনই ইউরোপেও অতি দক্ষিণপন্থার উত্থানের মাঝে শ্রমিক-কৃষকদের নাছোড় লড়াইগুলি আলোর ফুলকির মতো জ্বলজ্বল করছে।

(বিশিষ্ট সাংবাদিক **অর্ক ভাদুড়ি** লন্ডন থেকে প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছেন)

মধ্যপ্রদেশে এআইডিএসও-র গুনা জেলা সম্মেলন

শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, ব্যবসায়িকীকরণ করে গরিব ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, ছাত্রবৃত্তি চালু, সরকারি মেডিকেল কলেজ খোলার দাবিতে ১ ফেব্রুয়ারি এআইডিএসও-র উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশে অগ্রবাল ধর্মশালায় গুনা জেলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে জেলা জুড়ে স্কুল-কলেজ, গ্রাম এবং শহরের নানা এলাকায় ছাত্ররা লাগাতার প্রচার চালায়। শিক্ষক সহ সমাজের নানা স্তরের মানুষ অর্থসাহায্য দিয়ে, সবজি বিক্রেতারা সবজি দিয়ে এবং অন্যান্য দোকানদাররা নানা জিনিস দিয়ে সম্মেলনকে সফল করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সম্মেলন থেকে সভাপতি হিসেবে সুনীল সেন এবং সম্পাদক হিসেবে রাধেশ্যাম চন্দেল সহ জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

রাজ্য বাজেটে নেই শিক্ষায় পরিকাঠামো উন্নয়নের ভাবনা

এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় নির্বাচনসর্বস্ব রাজ্য বাজেটের নিন্দা করে ৮ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা আশা করেছিলাম এই বাজেটে স্কুল ও উচ্চশিক্ষায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, উচ্চশিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি করবে সরকার। কিন্তু এই বাজেটে তার কোনও রেশ দেখা গেল না।

পুরো বাজেটেই মূলত দান খয়রাতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশকে গড়ে তোলা ও তা রক্ষা করার উপযুক্ত কোনও পদক্ষেপ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্য সরকারও বাজেটে গঠনমূলক শিক্ষার থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে জোর দিল, যা বাস্তবে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করারই নামান্তর।

অনলাইন শিক্ষা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ বৃদ্ধির দিকে জোর দেওয়া হয়েছে, যা আসলে শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণের পথে আরও এক পদক্ষেপ। আমরা সরকারের এই শিক্ষাবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

পাঠকের মতামত

কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আদায়ের নতুন কল

আধার-প্যান সংযোগ করতেই হবে— এ হল কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর দপ্তরের ফতোয়া। না করলে প্যান নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। ৩০ জুন ২০২৩-এর মধ্যে যারা সেই সংযোগ করেনি, পরে তা করতে তাদের গুনতে হচ্ছে ১০০০ টাকা জরিমানা।

৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধরি সংসদে জানালেন, এখন পর্যন্ত জরিমানা বাবদ মোদি সরকার আদায় করেছে ৬০১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। সহজ হিসেবে বলা যায়, মাত্র ৬০ লক্ষ ১৯ হাজার ৭০০ জনের কাছ থেকে এই জরিমানা আদায় হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় আরও জানিয়েছেন, প্যান-আধার সংযোগ বাকি আছে আরও ১১ কোটি ৪৮ লক্ষের। ফলে সেই সংযোগ সম্পন্ন হলে আদায় হবে আরও ১১ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা।

যাঁরা প্যান-আধার সংযোগ করাননি, তাঁরা 'ফ্রি'-তে করানোর সময় অর্থাৎ ২০২৩ সালের ৩০ জুনের আগে কেন তা করাননি? খোঁজ নিলে জানা যাবে, তাঁদের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মোটা টাকা লেনদেন করতে হয় না। অথবা অজ্ঞতাবশত এসব কী ভাবে করতে হয় তা তাঁরা জানেন না। কিংবা, এই সংযোগ যে করতে হবে— এ কথাই জানা ছিল না তাঁদের। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এঁদের বেশিরভাগই গরিব মানুষ। প্যান-আধার সংযোগে জরিমানা আদায়ের নামে মোদি সরকার কিন্তু এই গরিব মানুষগুলির উপরেই এক বড়সড় আঘাত হানল।

এটা গরিব মানুষের কাছ থেকে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার নতুন 'কল'! এই 'কল' শুধু এখানেই বসানো হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম পরিমাণ টাকা না রাখলে জরিমানা বাবদ টাকা কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সেই বাবদ শুধুমাত্র স্টেট ব্যাঙ্কই জরিমানা চালুর পর প্রথম বছর ২০১৭-১৮ সালেই প্রায় ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা আদায় করেছে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির এই জরিমানা আদায়ের মোট যোগফল কত তা অবশ্য তারা জনগণকে ঢাকঢোল পিটিয়ে জানায়নি। ব্যাঙ্কে ন্যূনতম টাকা রাখতে না পারা এই মানুষগুলি কারা? এঁরাও হতদরিদ্র গরিব মানুষ। ন্যূনতম পরিমাণ টাকা রাখার সামর্থ্যও তাঁদের নেই। অথচ সেই মানুষগুলির কাছ থেকেই মোদি সরকার এই হাজার হাজার কোটি টাকা কেটে নিচ্ছে! এ ভাবেই বোধহয় 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ' ঘটাচ্ছে কেন্দ্রের মোদি সরকার!

গরিব কৃষকদের মাসে ৫০০ টাকা করে দেওয়াটা মোদি সরকার যেমন ফলাও করে প্রচার করে চলেছে, আর সেই টাকা পেয়ে কৃষকের কী বিপুল উন্নতি হচ্ছে, মোদিজি নিজেই 'মন-কী-বাত'-এ সে কথা যেমন করে জানাচ্ছেন, তেমন করে যদি টাকার আইনি-ছিনতাইয়ের নতুন 'কল'টার কথা প্রচার করতেন, তা হলে জনসাধারণ তাঁর গরিব-দরদের স্বরূপ আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারত।

সমীর দাস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

দখলদারির ট্র্যাডিশন

একের পাতার পর

মারাত্মক অভিযোগকে। গায়ের জোরে জমি দখল, লিজের নাম করে ভেড়ির জন্য জমি নিয়ে টাকা না দেওয়া, নেতাদের জমি বা ভেড়ি কিংবা বাড়িতে কাজ করিয়ে মজুরি না দেওয়া, প্রতিবাদ করলে রাতের অন্ধকারে মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে পরিবারের লোককে তৃণমূলের পার্টি অফিস কিংবা ক্লাবে তুলে এনে অত্যাচার করা, মহিলাদের সাথে অশালীন আচরণ ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরে চলছে, অবশেষে মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে।

শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আজ উঠছে, মহিলারা যে কথাগুলি সোচ্চারে বলছেন, তার কোনও একটিও পুলিশের অজানা ছিল না। যতদিন না শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিক্ষোভ আছড়ে পড়েছে ততদিন পুলিশ ছিল ভাবলেশহীন দর্শক। বিক্ষোভ ফেটে পড়ার পর পুলিশ কিছুটা সক্রিয়তার ভাব দেখালেও তারা উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তার করার আগে অপেক্ষা করে বসেছিল, কতক্ষণে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে তাকে সাসপেন্ড করার বার্তা আসে! বাকি দুই নেতাকে গ্রেপ্তারের জন্য কার সবুজ সংকেত লাগবে তা পুলিস কর্তারাই বলতে পারবেন। যদিও এলাকার মানুষের অভিযোগ, যে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ তার এফআইআর-এর ভিত্তিতেই এলাকার বহু সাধারণ মানুষ, বিক্ষোভকারী ও বিরোধী দলের কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। সিপিএমের এক প্রাক্তন এমএলএও গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সন্দেশখালিতে বর্তমান শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের ছবি অনেকটা যেন সিপিএম আমলে জঙ্গলমহলে দাপুটে সিপিএম নেতা অনুজ পাণ্ডে, ডালিম পাণ্ডেদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের ছবিটাকে মনে করিয়ে দিল আবার। এর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপিঠ, উত্তর ২৪ পরগণার সুটিয়াতে সিপিএম-তৃণমূল উভয় আমলেই একই রকম অত্যাচার দেখেছে মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে বসার আগে যে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা বহুদিন আগেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বর্তমানে আলোচ্য সন্দেশখালি এবং তার কাছাকাছি ভাঙড়, ক্যানিং এলাকাতে সাধারণ মানুষর উপর শাসকদলের দাপট দেখানো, শাসকদলের নেতাদের দখলে একরের পর একর জমি-ভেড়ি, প্রাসাদোপম অট্টালিকার জমানার কি কোনও পরিবর্তন তারা করেছে? সেই একই মুখগুলোর রাজনৈতিক জামার রংটা শুধু বদলেছে। যারা আগের আমলে ছিল সিপিএমের সম্পদ, তাদের অনেকেই তৃণমূলের সম্পদ হয়েছেন, মন্ত্রী কিংবা জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েতে সমিতির মাথাও হয়েছেন একই কায়দায়। রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও এই ধরনের 'সম্পদ'দের দল পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোনও পরিবর্তন তৃণমূল ঘটায়নি। ভোটবাজ শাসকদলগুলির চরিত্রই তাই।

এ রাজ্যের মানুষের ভোলার কথা নয়, ১৯৭৭-এর আগে রাজ্যের নানা অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়ানো কংগ্রেসি মস্তানরা কয়েক বছরের মধ্যে কী ভাবে শিবির বদল করে সিপিএম হয়ে গিয়েছিল। এখন তাদের উত্তরসূরীরা আরও পরিণত হয়েছে। ফলে তাদের আর বেশি সময় লাগছে না, ক্ষমতা বদলের গন্ধ পেলেই তারা রঙ বদল করে ফেলছে। এ ব্যাপারে বিজেপিও কম দড় নয়। তারাও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও টাকার জোরে বেশ কিছু বাহুবলী 'সম্পদ'কে কিনেছে। বাস্তবে, সারদা, নারদা মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের নিজেদের দলের নেতৃত্বে বসিয়ে 'সম্পদে' পরিণত করতে বিজেপি নেতারা পশ্চিমবঙ্গে যে দক্ষতা

সাতের পাতায় দেখুন

সিপিডিআরএস প্রতিনিধিরা পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন সন্দেশখালির মহিলারা

১২ ফেব্রুয়ারি অত্যাচারিত, সন্ত্রাসদীর্ণ সন্দেশখালির বিভিন্ন গ্রামে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর একটি প্রতিনিধি দল সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, মল্লারিকা কুণ্ডু, চঞ্চল ঘোষ এবং সফিক আলি। স্থানীয় মানুষ, বিশেষত মহিলারা তাঁদের কাছে নির্যাতনের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তাঁরা বলেন, পুলিশ কোনও অভিযোগ শোনেনি, বরং অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য অনেককে গ্রেফতার করেছে। এখনও অনেকে নিখোঁজ রয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সমগ্র সন্দেশখালিতে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে এই সংবাদ বাইরের মানুষের কাছে না পৌঁছায়। সাংবাদিকদেরও গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাউকেও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এ সব বাধা সত্ত্বেও, সিপিডিআরএস-এর প্রতিনিধি দল যখন মানুষের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়, তখন বহু মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁরা বলেন দুষ্কৃতী বাহিনী প্রতি রাতে

বাড়িতে বাড়িতে হুমকি দিচ্ছে। তাদের দিয়ে জোর করে কাগজে সই করিয়ে বলানো হচ্ছে 'কোনও অত্যাচার হয়নি'। পুলিশ যখন-তখন বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা সিপিডিআরএস প্রতিনিধি দলকে এই খবর বাইরের মানুষকে জানানোর কথা বলেন। তাঁরা দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান এবং এলাকার শান্তি ফেরানোর দাবি করেন।

জীবনাবসান

বীরভূমে দলের সিউড়ি লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সিরাজুল মনির ৮ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কিছু দিন থেকে বয়সজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

কমরেড সিরাজুল মনির ষাটের দশকের মধ্যভাগে ছাত্রাবস্থায় দলের সাথে যুক্ত হন। জীবনের শুরুতে প্রয়াত নেতা কমরেড রমাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও দলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সান্নিধ্যে দলের সাথে ঘনিষ্ঠ হন। প্রবল আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। পঞ্চায়েতে চাকরি করতেন। কর্মক্ষেত্রে যখনই যে পঞ্চায়েতে কাজ করেছেন সেখানে অন্যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতেন। তাঁর সততা ও দৃঢ়তার জন্য একদিকে যেমন মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, অন্য দিকে কংগ্রেস, সিপিএম জমানাতে দুর্নীতিগ্রস্ত কায়েমি স্বার্থবাদীদের দ্বারা হেনস্থা, হুমকি ও সন্ত্রাসের কবলে পড়েছেন। এমনকি গ্রাম ছাড়তেও হয়েছে। কিন্তু কখনও নতিস্বীকার করেননি।

গণসংগঠন বা ফোরামের সাথে যুক্ত থাকলেও বরাবর দলের জেলা, লোকালের অফিস কেন্দ্রিক কাজই মূলত করতেন এবং নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ বিষয়ে তার বিশেষ দক্ষতাও ছিল। প্রথম থেকেই বৃত্তি পরীক্ষার জেলা অফিস সংক্রান্ত শ্রমসাধ্য কাজ অনেকটা একক ভূমিকায় করেছেন। ৩-৪ বছর আগে ট্যাক্স কালেক্টরদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলায় মুখ্য ভূমিকা নেন। প্রথম পার্টি কংগ্রেসের সময় তিনি দলের সদস্য পদ লাভ করেন। পরিবারের সদস্যরা দলের কাজে যুক্ত হোক আন্তরিকভাবে চাইতেন এবং চেষ্টাও করেছেন।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দ্রুত কমরেড ও আত্মীয়-স্বজনরা হাসপাতালে পৌঁছে যান। সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ জেলা অফিসে আনা হলে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরদিন জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কমরেডরা তাঁর বাড়িতে শায়িত মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তারপর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড সিরাজুল মনিরের মৃত্যুতে দল হারাল দীর্ঘদিনের একজন বিশ্বস্ত সাথীকে।

কমরেড সিরাজুল মনির লাল সেলাম

তুঘলকি নিয়মে বেরিয়ে এল শিক্ষাব্যবস্থার ঘুণধরা চেহারা

মাধ্যমিক পরীক্ষা

গণতন্ত্রে 'দায়িত্ব' ও 'অধিকার' অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি এই অধিকার এবং দায়িত্ব— এই বিষয়দুটির মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে দিচ্ছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষণ, রুটিন সব ঠিক হয়ে যায় প্রায় এক বছর আগেই। এবারও তাই হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর সপ্তাহ দুই আগে হঠাৎ একটি নোটিশ জারি করে জানানো হল, পূর্ব নির্ধারিত বেলা বারোটার পরিবর্তে এবারের মাধ্যমিক শুরু হবে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে। শিক্ষকদের পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হতে হবে সকাল সাড়ে আটটায়। মাধ্যমিকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সময়সূচিতে এই পরিবর্তন হঠাৎ কেন আনতে হল, তাও পরীক্ষার মাত্র সপ্তাহ দুই আগে, যখন শিক্ষক-পরীক্ষার্থী সহ সকলেই বারোটা থেকে তিনটে পরীক্ষা জেনে সেইমতো যাতায়াত এবং অন্যান্য বিষয়ে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে? এর কোনও সদুত্তর পর্ষদের থেকে পাওয়া যায়নি। সকাল দশটায় স্কুলে যেতেই যাঁদের দূর-দূরান্ত থেকে ভোরের বাস বা ট্রেন ধরতে হয়, কীভাবে এত সকালে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছবেন সেই শিক্ষকরা? বাড়িতে শিশু, বয়স্ক বা অসুস্থ কারও রান্না এবং পরিচর্যা সেরে বেরোতে হয় যাঁদের, তাঁরাই বা কী ব্যবস্থা করবেন এত কম সময়ের নোটিশে? শীতের কুয়াশায় যখন প্রায়শই ট্রেন বাতিল বা লেট হয়, সেই পরিস্থিতিতে কেউ পথে আটকে গেলে কী হবে?

গ্রামের চিত্র আরও কঠিন। শুধু শিক্ষকই নন, বহু ছাত্রছাত্রীও সেখানে নদী পেরিয়ে, বহুদূরের পথ হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসে। তাদের সবার জন্যই কি অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেল না এই সিদ্ধান্ত ? সবচেয়ে বড় কথা, এরকম একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-অভিভাবক সহ কারও মতামত নেওয়ার বা জরুরি বৈঠক ডাকারও প্রয়োজন মনে করেনি পর্ষদ। এসটিইএ শিক্ষক সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছিল, একটি জনস্বার্থ মামলাও হয়েছিল। সেসব যথারীতি ভেসে গেছে সরকারি হকুমের তোড়ে।

পরীক্ষা শুরুর দিন দুই আগে জানা গেল, পরিদর্শক-শিক্ষকদের এবার অতিরিক্ত একগুচ্ছ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নপত্রের খামের নির্দিষ্ট ক্রমিক নম্বর থাকবে এবং প্রতি প্রশ্নপত্রেরও ক্রমিক নম্বর থাকবে। সেই নম্বর অনুযায়ী পরপর পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন দিতে হবে, তারা খাতায় এবং অতিরিক্ত পাতা নিলে তার প্রতিটিতেও আট অঙ্কের সেই সংখ্যাটি লিখতে হবে। শিক্ষক সই করার আগে সেটি প্রতিবার মিলিয়ে নেবেন। আবার পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রতিটি ঘরে একটি করে ফর্ম দেওয়া হবে, যেখানে ওই ঘরের পরীক্ষার্থী সংখ্যা, প্রশ্নপত্রের খামের নম্বর, প্রশ্নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা, কোনগুলো ব্যবহার হল, কেউ অনুপস্থিত থাকলে কোনগুলো অব্যবহৃত থাকল সেইসব প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা ইত্যাদি লিখতে হবে। উত্তরপত্রের সাথে ম্যাপ বা গ্রাফ থাকলে খাতার ওপর সেটা লিখে আবার সই করতে হবে শিক্ষককে। প্রতিদিনের হাজিরার কাগজেও প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে পুরো নাম সই করতে হবে এবং প্রশ্নপত্রের ওই আট অঙ্কের ক্রমিক নম্বরটি আবার লিখতে হবে। শোনা গেছে, প্রশ্ন ফাঁস হওয়া আটকানো এবং পরীক্ষা 'নির্বিঘ্নে' সুসম্পন্ন করার জন্যই নাকি এত কাণ্ড। অথচ পরীক্ষার তিন ঘন্টা সময়ের মধ্যে যদি পাঁচ ছয় সাত বার শিক্ষক খাতা চেয়ে তথ্য মিলিয়ে সই করেন, এত বড় সংখ্যা এতবার লিখতে হয়, তাহলে পরীক্ষার্থীদের মনঃসংযোগের ক্ষতি হয় না কি? এর পিছনে যতখানি সময় চলে যাচ্ছে তারই বা কী হবে? শিক্ষকরা যদি এতরকম সই আর ফর্ম ফিল আপে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে পরীক্ষার হলে প্রয়োজনীয় নজর রাখার কাজটাই বা তাঁরা কীভাবে ঠিক করে করবেন?

যথারীতি এরও কোনও উত্তর নেই পর্ষদের কারও কাছে। প্রথম দু-তিনদিনের পরীক্ষার পরই বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা গেল প্রশ্নপত্রের খামে কোনও নম্বরই নেই। কাজেই যে নম্বর লেখার গুরুদায়িত্ব শিক্ষকদের ওপর দেওয়া হল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পর্ষদ নিজেই তা ঠিক করে পালন করেনি।

তবে, শ্রেষ্ঠ চমকটি দেখা গেল অঙ্ক পরীক্ষায়। বিগত বছরে অঙ্ক পরীক্ষার দিন কোনও গ্রাফ পেপার সরবরাহ করা হয়নি। তাহলে গ্রাফের অঙ্ক কীভাবে কোথায় করবে এই প্রশ্নের উত্তরে পর্ষদ থেকে বলা হয়েছিল, ছাত্রছাত্রীদেরই খাতায় ছক কেটে গ্রাফের অঙ্ক করতে হবে। আর এবার প্রশ্নের খাম খুলে দেখা গেল, প্রশ্নের সাথে গ্রাফ পেপার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রশ্নে গ্রাফের কোনও অঙ্কই নেই! পরীক্ষা সম্পর্কে কতদূর দায়সারা মনোভাব এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার বিভিন্ন স্তরে কতখানি সংযোগহীনতা থাকলে এমন প্রহসন ঘটতে পারে!

এখানেই শেষ নয়। এর পরেও আরও অদ্ভুত নির্দেশ এসেছে। ওই অপ্রয়োজনীয় গ্রাফ পেপারটি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে দিতে হবে। তারা সেটিতে নাম ইত্যাদি লিখবে, খাতার সাথে জুড়ে দেবে এবং যথারীতি পরিদর্শক শিক্ষক আবার সেগুলো মিলিয়ে সই করবেন। অর্থাৎ, যে গ্রাফ কাগজটির সাথে পরীক্ষার কোনও সম্পর্কই নেই, সেটির পিছনেও পরীক্ষা চলাকালীন কিছুটা সময় দিতে বাধ্য হল পরীক্ষার্থীরা।

বিগত কিছু বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের 'চেক' করার নামে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রায় যুদ্ধকালীন পরিবেশ তৈরি করা, সরকারি স্কুলগুলোর পড়াশুনার পরিবেশ নষ্ট করে প্রাইভেট টিউশনে মদত দিয়ে আবার মাঝেমাঝে লোকদেখানো টিউশন নিষিদ্ধ করার নোটিশ জারি করা, কিছু কিছু বিষয়ের প্রশ্নপত্র প্রতি বছরই অনাবশ্যক কঠিন এবং জটিল করে তোলা— এসব প্রসঙ্গ না হয় বাদ দেওয়াই গেল। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ যারা, সেই সাধারণ শিক্ষকসমাজ, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী সকলের কাছেই এটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে, যা হচ্ছে তাই মুখ বুজে মেনে নেওয়া ছাড়া এই বিরাট কর্মকাণ্ডে তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই। নেই মতপ্রকাশের অধিকারও। আর এই অধিকারহীন দায়িত্বের অপর প্রান্তে বসে আছেন সরকারি কর্তাব্যক্তিরা, যাঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত গাফিলতি করেও একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করতে পারেন। একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে যেতে পারেন এবং সেসব সিদ্ধান্ত যতই হাস্যকর বা অসুবিধাজনক হোক, তাকেই 'দায়িত্ব' বলে অন্যের ওপর চাপিয়েও দিতে পারেন।

মাধ্যমিকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এই চূড়ান্ত অরাজকতা এবং অবিবেচনা শিক্ষাব্যবস্থার ঘুণধরা চেহারাটাই আরও স্পষ্ট করে তুলল।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

তিনের পাতার পর

'রাষ্ট্র' এখানেও প্রয়োজন। কিন্তু এই রাষ্ট্র এখন আছে উত্তরণকালীন পর্যায়ে। যথার্থ অর্থে একে এখন আর রাষ্ট্র বলা যায় না। কারণ গতকালও যারা ছিল মজুরি দাস সেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা সংখ্যালঘু শোষককে দমনের বিষয়টা তুলনামূলকভাবে এতটাই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক একটা কাজ যে, এই দমনের জন্য যতটুকু রক্তপাতের প্রয়োজন হয় তা দাস, ভূমিদাস বা মজুরি দাসদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় রক্তপাতের তুলনায় অনেক কম। এর জন্য মানব জাতিকে মূল্য দিতে হয় অনেক কম। জনগণের অধিকাংশের জন্য সম্প্রসারিত গণতন্ত্রের সাথে এ সঙ্গতিপূর্ণ। এর ফলে দমনের যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যেতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, জনগণকে দমনের জন্য জন্য প্রয়োজনীয় অত্যন্ত জটিল দমন যন্ত্রের অভাবে শোষকরা এই কাজ করতে পারে না। কিন্তু জনগণ একেবারে সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে, এমনকি প্রায় কোনও বিশেষ দমন যন্ত্র ছাড়াই, শোষকদের দমন করতে পারে। তখন তার দরকার হয় সশস্ত্র জনগণের সরল একটা সংগঠন (আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে বলতে পারি, যেমন ধরুন, শ্রমিক সৈনিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েত)।

সব শেষে, একমাত্র সাম্যবাদই পারে রাষ্ট্রকে পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় করে ফেলতে। কারণ, এখন দমন করার মতো কেউ নেই। 'কেউ' বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে একটা শ্রেণিকে, বোঝানো হচ্ছে জনগোষ্ঠীর একটা নির্দিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ সংগ্রামকে। আমরা কল্পনাবিলাসী নই। কোনও ব্যক্তি যথেচ্ছাচার করতে পারে, বা তাঁর এই যথেচ্ছাচারকে দমন করার প্রয়োজনের সম্ভাবনাকে আমরা একেবারেই অস্বীকার করছি না। কিন্তু প্রথমত, এর জন্য কোনও বিশেষ দমনের যন্ত্র প্রয়োজন হবে না। যেমন করে, আজকের এই আধুনিক সমাজে দুজন লোককে হাতাহাতি করতে দেখলে একদল সুসভ্য লোক তাদের ছাড়িয়ে দেন, বা একজন মহিলার লাঞ্ছনা তারা প্রতিহত করে, সেভাবেই সশস্ত্র জনগণই এই কাজটা করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি, এই যথেচ্ছাচার, সমাজ জীবনের নিয়ম লঙ্ঘনের রূপে যার প্রকাশ ঘটে, তার মৌলিক সামাজিক কারণ হল, জনগণের উপর শোষণ, তাদের অভাব ও দারিদ্র্য। এই মূল কারণটা যদি দূর করা যায়, তাহলে এই যথেচ্ছাচারও 'বিলীন হয়ে যেতে' শুরু করবে। আমরা জানি না কত দ্রুত এবং কোন ক্রম অনুযায়ী তা লোপ পাবে। এই সব বিলীন হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হবে।

এই ভবিষ্যতকে এখন যে সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা যায়, কল্পনাবিলাসকে আমল না দিয়ে মার্ক্স যাকে আরও পরিপূর্ণরূপে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তা হল, সাম্যবাদী সমাজের নিচের স্তর ও উপরের স্তরের মধ্যেকার পার্থক্য। (চলবে)

দখলদারির ট্র্যাডিশন

ছয়ের পাতার পর

দেখিয়েছেন, চক্ষুলজ্জার বালাইটাও একেবারে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছেন, তাতে তাদের চরিত্রও বুঝতে মানুষের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আজ সন্দেশখালির ঘটনায় সাধারণ মানুষের উপর শাসকদলের মস্তান ও নেতাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের এই প্রতিবাদ অত্যন্ত জরুরি এবং সমর্থনযোগ্য। একই সঙ্গে একটা বিষয় তাঁদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করব, জনসাধারণের স্বার্থবাহী সঠিক রাজনীতির প্রতিষ্ঠা ঘটাতে না পারলে বারে বারে স্বতঃস্ফূর্ত জনবিক্ষোভ ভোট রাজনীতির চোরাগলিতেই হারিয়ে যায় কি? এই রাজ্যে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, যতদিন সামগ্রিকভাবে এলাকার জনসাধারণকে নিয়ে গড়ে তোলা গণকমিটির ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, ততদিন শাসকের শত অত্যাচারও মানুষের মাথা নোয়াতে পারেনি। কিন্তু যখনই সেই গণকমিটিকে দুর্বল করে বর্তমান শাসকদল তার সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থে মানুষকে ব্যবহার করতে চেয়েছে, মানুষের আন্দোলন দুর্বল হয়েছে, তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে বারবার গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে এই গণকমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে এসইউসিআই(সি)। সন্দেশখালির জনগণকেও ভাবতে হবে বর্তমান রাজ্য সরকারি দলের দাপট, দুর্নীতি, মস্তানিকে রুখতে জনগণ যদি ভেবে নেন এদের বদলে এদেরই প্রতিপক্ষ যে কোনও আর একটা দলকে বসিয়ে দিলে, নিজেদের দায়িত্ব শেষ, তবে জনগণের আবার সর্বনাশ হবে। তৃণমূলের আজকের মস্তানদের রুখতে হলে, এমনকি ভোটেও সরকার বদলের কথা ভাবতে হলে জনস্বার্থকে সামনে রেখে গণকমিটির ভিত্তিতে আন্দোলনের পথেই মানুষের সংগঠিত শক্তি অর্জন করতে হবে। না হলে আরও অনেক এই রকম শাহজাহান, উত্তম, শিবু হাজরারা সুবিধা মতো আর একটি দলে নাম লিখিয়ে একই কাজ চালিয়ে যাবে। আবার হয়ত ক্ষোভে ফেটে পড়বে মানুষ, তার সুযোগ নেবে আর একটা একই রকম নীতিহীন ক্ষমতালোভী দল! এটাই কি চলতে দেব আমরা?

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

১৬ ফেব্রুয়ারি গ্রামীণ বনধ

সর্বাত্মক সফল করার ডাক এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৯ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, এটা খুবই গর্বের বিষয় যে, দেশের শ্রমিক ও কৃষকরা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আবার আন্দোলনের পথে নেমেছেন। তাঁরা সংযুক্ত কিসান মোর্চা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে ১৬ ফেব্রুয়ারি শিল্প-কারখানা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং গ্রামীণ এলাকায় বনধের ডাক দিয়েছেন।

আমরা এই বনধকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন দৃঢ়তার সাথে শ্রমিক-কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে বনধকে সর্বাত্মক সফল করে তোলেন।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন রদের দাবিতে

৬ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ

বিদ্যুৎ বিল ২০২২-কে আইনে পরিণত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই আইনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ শিল্পের সার্বিক বেসরকারিকরণ, ট্যারিফ বৃদ্ধি, প্রিপেড স্মার্ট-মিটার বসানো, তাতে টিওডি এবং ডায়নামিক ফেয়ার প্রাইস সিস্টেমে বিল আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ক্ষোভ। এর বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন ৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছিল। দেশ জুড়ে দিনটি বিপুল আগ্রহে পালিত হয়।

দিল্লি

কর্ণাটক

দিল্লি ঃ যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের নেতা এবং এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি সত্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল সম্পূর্ণ রদ করার জন্য আন্দোলন শক্তিশালী করার ডাক দেন। বলেন, সারা দেশের কৃষকরা সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পাশে দাঁড়িয়ে এই আন্দোলনকে সফল করবেন। দিল্লি বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনের সম্পাদক ভাস্করানন্দ সমগ্র কর্মসূচি পরিচালনা করেন।

ত্রিপুরা ঃ একই দিনে ত্রিপুরা ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বনমালীপুরে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভা হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য আহ্বায়ক সঞ্জয় চৌধুরী।

কর্ণাটক ঃ কর্ণাটকে বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কের বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কে ভেনুগোপাল। বিক্ষোভ সভা থেকে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বিক্ষোভ হয়। মেদিনীপুরে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক চণ্ডীচরণ হাজরা, রাজ্য কমিটির সদস্য দীপক পাত্র, শহর সম্পাদক সুশান্ত সাহু, ভবানী চক্রবর্তী। কর্পোরেটপন্থী জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিলে অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের শহর সভাপতি দীপক বসু।

ত্রিপুরা

স্কিম ওয়ার্কারদের বিক্ষোভে পুলিশি হামলা

গ্রেফতার ৩৬, কর্মবিরতির ডাক

রুরাল ও আরবান আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের ভাতা বৃদ্ধি, মোবাইল দেওয়া, অবসরকালীন ভাতা ৫ লক্ষ টাকা নিশ্চিত করা, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য সহ অন্যান্য নানা সুবিধা প্রদানের বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার বাজেটে কোনও ভাতা বৃদ্ধি করেনি।

প্রতিবাদে ১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাকচুয়াল) ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে এ দিন দুপুরে কলকাতার এসপ্ল্যানেডে ওয়াই চ্যানেল থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। সংগঠনগুলির এক প্রতিনিধিদল দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে স্মারকলিপি দিতে গেলে তিনি তাঁদের দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখেন।

অন্য দিকে কয়েকশো স্কিম-কর্মী যখন কিছুক্ষণ শান্তিপূর্ণ অবস্থান চালানোর পর তা তুলে নেন, তখন হঠাৎ পুলিশ বাহিনী মহিলাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে, কিল চড় লাথি ঘুষি চালায়, অশালীন আচরণ করে এবং চুল ধরে টানতে টানতে স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন সহ ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের এই বর্বর আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন অল ইন্ডিয়া স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি টি সি রমা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্য জুড়ে স্কিম ওয়ার্কারদের কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়।

মোদি শাসনে সরকারি সংস্থাগুলিতেও কর্মীসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ কমানো হয়েছে

রাজ্যসভায় দেওয়া এক ভাষণে গত ৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে জানিয়েছেন, গত দশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলি শক্তিশালী হয়েছে। শেয়ার বাজারে তাদের শেয়ারের দাম বেড়েছে। অথচ এর মাত্র কয়েকমাস আগে গত জুনে 'পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস সার্ভে রিপোর্ট'-এর যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, গত দশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলিতে নিয়োগ বিপুল ভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যেটুকু কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে গেছে, তার বেশিরভাগটাই আবার চুক্তির ভিত্তিতে কাজ, অর্থাৎ অস্থায়ী চাকরি।

পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস সার্ভে রিপোর্ট দেখাচ্ছে, সরকারি এই সংস্থাগুলিতে ২০১৩-র মার্চে যেখানে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৭.৩ লাখ, ২০২২-এর মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৪.৬ লাখে। অর্থাৎ কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে মোট ২ লক্ষ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে গেছে।

রিপোর্টে আরও দেখা যাচ্ছে, শুধু লোকসানে চলা সংস্থাগুলোতেই নয়, যে সব সংস্থা যথেষ্ট মুনাফা করছে, সেখানেও কমানো হয়েছে কাজের সুযোগ। এর পাশাপাশি, স্থায়ী কর্মচারীর বদলে সরকারি সংস্থাগুলিতে বেড়েছে চুক্তিতে নিয়োগের পরিমাণ। ২০১৩-তে চুক্তিতে নিযুক্ত ছিলেন ১৭ শতাংশ কর্মচারী। ২০২২-এ চুক্তি-কর্মচারী বেড়ে পৌঁছেছে ৩৬ শতাংশে। বেড়েছে দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মীর সংখ্যাও। ২০২২-এ চুক্তি-কর্মচারী ও দিনমজুররা মোট কর্মচারীর প্রায় ৪৩ শতাংশে পৌঁছেছেন, ২০১৩-তে যা ছিল ১৯ শতাংশ।

বেকার সমস্যায় দেশ জেরবার। কর্মহীনতার হার অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৪ সালে প্রথমবার কেন্দ্রে সরকারে বসার আগে নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রতি বছর ২ কোটি বেকারকে কাজ দেবেন। সে সব প্রতিশ্রুতি যে স্রেফ ভোটের লক্ষ্যে কিছু কথার কথা ছিল, মানুষ এতদিনে তা বুঝে গেছে। ফলে সে আশা মানুষ আর করে না। এটাও সত্য যে, যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দেশে কায়েম রয়েছে, তার নিজস্ব নিয়মে দেশে নতুন শিল্প কল-কারখানা হওয়া দূরে থাক, ক্রমাগত সে সব বন্ধ হচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। এই অবস্থায় একটা সরকারের তো উচিত দেশের বিপুল সংখ্যক বেকারের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা! কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিজেপি সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলিতে পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপক মাত্রায় ছাঁটাই করছে। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থায়ী পদগুলিকে চুক্তিভিত্তিক তথা অস্থায়ী করে ফেলছে। যুবসমাজের উন্নয়ন নিয়ে অবিরাম গলা ফাটান যাঁরা, সেই প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীরা বাস্তবে তা নিয়ে কতখানি আন্তরিক, এই পরিসংখ্যানই তা স্পষ্ট করে দেয়। এটাই আসলে নরেন্দ্র মোদির 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'-এর নমুনা!

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com